www Contents .com represents

Dr. Zakir Naik's Bangla Ebook

ISLAM E NARIR ODHIKAR, SEKELE NAKI ADHUNIK
(WOMEN'S RIGHT IN ISLAM, OUTDATED OR MODERN)

Contents

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা

দীর্ঘ দুইশ' বছর সংগ্রামের মাধ্যমে পশ্চিমা নারীরা আজ লাভ করেছে আর্থ– সামাজিক, আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার। তাদের অর্জিত ফসলকেই উপস্থাপন করা হয় 'নারী স্বাধীনতা'র মডেল হিসেবে। কিন্তু এই কথিত স্বাধীনতা তাদের কতটুকু অধিকার দান করেছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ নারী সমাজ আজ নানাবিধ সামাজিক অসুস্থতায় আকীর্ণ, সমস্যায় পীড়িত। পদে পদে তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে বৈরী পরিস্থিতি। বলা হয়ে থাকে, এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজ হারিয়েছে পারিবারিক জীবনের সুখানুভূতি। হারিয়েছে সম্মান, মর্যাদা এবং নারীত্ব। অথচ আজ থেকে প্রায় সাড়ে ১৪'শ বছর পূর্বেই ইসলাম নারীদের দিয়েছে মর্যাদা, দিয়েছে সঙ্গত অধিকার– যখন সমসাময়িক সভ্যতায় নারী ছিল চরম বঞ্চিত ও অবহেলিত। দীর্ঘ সাড়ে ১৪'শ বছর পূর্বে ইসলাম প্রদত্ত সেসব অধিকার কালপরিক্রমায় কতটুকু কালোত্তীর্ণ সেটাই আজকের আলোচ্য বিষয়। ইসলামের অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষিত সেসব অধিকার পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবো নারীদের জন্য প্রদত্ত সেসব অধিকার বর্তমান সময়ে পর্যাপ্ত বা প্রযোজ্য কি না। এটা কি সেকেলে, নাকি আধুনিক?

নারী অধিকার ও মর্যাদা

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী- 'নারীর অধিকার হলো ঐ সকল অধিকার, যা একজন নারীকে সামাজিক এবং আইনগত সমতার দিক দিয়ে পুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করে।' অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী- সেগুলো হলো ঐ সকল অধিকার, যা নারীদের জন্য পুরুষের সমান দাবি করা হয়েছে- ভোট প্রয়োগ এবং সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি। মর্ডান অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী এর অর্থ-'আধুনিক করা, আধুনিক প্রয়োজন বা অভ্যাসের সাথে খাপ খাওয়ানো।' ওয়েবস্টার অনুযায়ী এর অর্থ আধুনিক করা, নতুন বৈশিষ্ট্য বা আকৃতি দান করা, যেমন- কারো ধারণার আধুনিকায়ন।

সংক্ষেপে, আধুনিকায়ন হলো বর্তমান অবস্থার চাইতে উন্নততর করার (হওয়ার) জন্য সমসাময়িক হওয়া বা একটি পন্থা বাছাই করা।

আমরা কি মানবজাতির জন্য নিজেদের আধুনিক বানাতে, আমাদের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে জীবনের নতুন পন্থা উপলব্ধি করতে পারি?

মহিলারা কী ধরনের জীবনযাপন করবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ এবং আরাম কেদারায় বসে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে ধারণা দিয়েছেন আমি সেগুলোর সাথে একাত্ম নই। আমি যে বর্ণনা ও মন্তব্যগুলো উপস্থাপন করছি তার ভিত্তি সত্য এবং সেগুলো পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ বিশ্লেষণ এবং সত্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে নিশ্চিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত।

আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তাবতার আলোকে যাচাই করা উচিত, অন্যথায় অনেক সময়েই অনেক মানবিক অনুসিদ্ধান্ত (Hypothesis) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাস্তবেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক সময় বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী সমতল ছিল গোলাকার ছিল না।

আমরা যদি পশ্চিমা মিডিয়া বর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইসলামে নারীর অধিকার'-এর সাথে একমত পোষণ করি, তাহলে এ কথা বলা ছাড়া আর বিকল্প থাকে না যে ইসলামে নারীর অধিকার সেকেলে। নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে তাঁর দেহ ভোগের মেকি প্রতারণা বৈ ভিন্ন কিছু নয়। নারীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা এবং তাঁর নারী সত্তাকে অবমূল্যায়ন করার নামান্তর।

পশ্চিমা যে সমাজ নারীর মর্যাদাকে উন্নত করতে চায়, তারা বাস্তবে নারীদেরকে গৃহকর্ত্রী থেকে উপপত্নীর স্তরে নামিয়ে আনতে চায়। তাঁদেরকে প্রজাপতি নয় বরং যৌন ব্যবসায়ী ও আনন্দ অন্বেষণকারীর হাতের ক্রীড়নক বানাতে চায়। যা কিনা কালচারের ছদ্মবেশে রঙিন পর্দার আড়ালে বিদ্যমান। অথচ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের মৌলিক বৈপ্লবিক আদর্শ জাহিলিয়াতের যুগেই মহিলাদের উপযুক্ত অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামের লক্ষ্য ছিল এবং এখনো আছে- আমাদের চিন্তাকে আধুনিক করা, আমাদের জীবন-যাপন, আমাদের দেখা-শুনা, সমাজে নারীদের শৃঙ্খলমুক্ত করা ও তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি ও চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় সামনে যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করবো।

এক. পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার আনুমানিক এক পঞ্চমাংশ মুসলিম। তবে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন রকমের। ব্যবহারিক দিক দিয়ে কোনো কোনো সমাজ ইসলামের কাছাকাছি আবার কোনো কোনো সমাজ অনেক দূরে অবস্থান করে।

দুই. 'ইসলামে নারীর অধিকার'-এর মূল্যায়ন হবে ইসলামের মূল উৎসের আলোকে। মুসলমানরা কী করে তার ওপর ভিত্তি করে নয়।

তিন. ইসলামের মূল উৎসগুলো হলো, পবিত্র কুরআন-আল্লাহর বাণী এবং সুন্নাহ যা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বাণী।

চার. কুরআন নিজের সাথে বৈপরীত্য করে না এবং সহীহ হাদীসেও অন্য হাদীসের সাথে বৈপরীত্য নেই, এমনকি এ দুই মূল উৎস কখনো একে অপরের সাথে বৈপরীত্য করে না।

পাঁচ. কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক সময় পণ্ডিতগণ মতানৈক্য করেন। এ মতানৈক্য কুরআনের সামগ্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দূর করা যায়। তবে একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এটা দূর করা সম্ভব নয়। কারণ কুরআনের নির্দিষ্ট কোনো আয়াত যদি জটিল হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই কুরআনেরই অন্য কোথাও তার সমাধান আছে। কিছু লোক হয়তো এক সূত্র উল্লেখ করে অন্যগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারে।

ছয়. প্রত্যেকটি মুসলিম নারী-পুরুষ যাই হোক তার কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়ায় কাজ করা। নিজের মতে সন্তোষ অর্জন ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়। ইসলাম নারী-পুরুষের

সমতায় বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে সমতা মানে অভিন্নতা নয়। ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক – বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের – বিরোধিতার নয়। আধুনিক সেকেলে নয়।

আমি "ইসলামে নারীর অধিকার" মূল্যায়নের ক্ষেত্রকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি।

১. আত্মিক অধিকার
২. অর্থনৈতিক অধিকার
৩. সামাজিক অধিকার
৪. বিদ্যার্জনের অধিকার
৫. আইনানুগ অধিকার
৬. রাজনৈতিক অধিকার।

চিত্র : ইসলামে নারী অধিকার

আত্মিক অধিকার

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা এই যে, তারা ভেবে থাকে ইসলামে জান্নাত শুধু পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়।

কুরআনের আয়াত-এর মাধ্যমে এ ভুল ধারণা দূর করা যায়। সূরা নিসা এর ১২৪ তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

অর্থ ঃ যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।

সূরা আন-নাহল এর ৯৭ তম আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ ঃ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।

সুতরাং বোঝা যায় যে, ইসলামে জান্নাতে প্রবেশের জন্য জেন্ডার (লিঙ্গ) কোনো মাপকাঠি নয়। আপনি কি এ ধরনের অধিকারকে আধুনিক বলবেন, না কি সেকেলে বলবেন? পশ্চিমা মিডিয়াগুলোয় এ ক্ষেত্রে আরেকটি ভুল ধারণা রয়েছে। আর তা হলো– 'নারীর কোনো আত্মা নেই।'

এটা বাস্তবে ছিল সপ্তদশ শতকে, যখন বিত্তবানদের কাউন্সিল রোমে সমবেত হয়েছিল এবং তারা সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছিল যে, নারী-পুরুষের কোনো আত্মা নেই। অথচ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর একই প্রকৃতির আত্মা রয়েছে যা সূরা নিসায় সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.

অর্থ ঃ হে মানবমণ্ডলী! ভয় কর তোমাদের প্রভুর যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গিনীকে।

পবিত্র কুরআনে সূরা আশ শূরা এর ১১ তম আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন, فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

ইসলামে নর নারীর আত্মার প্রকৃতি একই। ইসলামে এ ধরনের অধিকারকে আপনারা পশ্চাৎপদ বলবেন নাকি আধুনিক?

আল-কুরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আত্মা মানবের মধ্যে ফুঁকে দিলেন।

এ সম্পর্কে সূরা আল হিজর এর ২৯ তম আয়াতে উল্লেখ আছে–

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ .

অর্থ ঃ অতঃপর আমি যখন তাঁকে (আদম (আ)) ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব তখন তোমরা তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো।

একই বিষয়ে সূরা সাজদা এর ৯ম আয়াতে মহান আল্লাহ পুণরায় বলেছেন,

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ

অর্থ ঃ অতঃপর তিনি তাঁকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন।

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যে বললেন–'তাঁর (মানবের) মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন' এর অর্থ– অবশ্যই যীশুর রক্তমাংস দেহ বা সর্বেশ্বরবাদী তত্ত্বের রূহ ফুঁকে দেয়ার মানে নয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তাঁর থেকে আত্মিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আরও দান করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর জ্ঞান যাতে মানবতা তার নিকটবর্তী হতে পারে। আরো কথা হলো, এখানে আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের কথাই বলা হয়েছে, উভয়কেই আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁক দেয়া হয়েছিল। পুনরায় আমরা আল-কুরআনে পড়ছি যে আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, যেন মানুষ তাঁর ফরমান দুনিয়ায় জারি করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈল এর ৭০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

এখানে সকল আদম সন্তানকে অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীকে সম্মানিত করা হয়েছে। কিছু ধর্মশাস্ত্রে রয়েছে, যেমন বাইবেল, যা মানবতার পতনের জন্য হাওয়া (আ)-কে দায়ী করে। বাস্তবে যদি আপনি আল-কুরআনের ৭নং সূরা আরাফ এর ১৯ থেকে ২৭ নং আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, দেখবেন সেখানে আদম ও হাওয়াকে

অসংখ্য বার সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়েই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন, উভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করেছিলেন এবং উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল।

বাইবেলের 'জেনেসিস' এর ৩য় অধ্যায় পড়লে দেখতে পাবেন মানবতার পতনের জন্য শুধু হাওয়া (আ)-কে দায়ী করা হয়েছে এবং 'মূল পাপ'-এর বিশ্বাস অনুযায়ী হাওয়া (আ)-এর কারণে সকল মানবতা পাপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। বাইবেলের জেনেসিস, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক নং ১৬-তে নারীদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে- তুমি গর্ভধারণ করবে, দুঃখের মাঝে জন্ম দেবে, তোমার আশা হবে তোমার স্বামী এবং সে তোমাকে শাসন করবে। অর্থাৎ গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানকে বাইবেলে নারীদের জন্য অসম্মানজনক এবং প্রসব বেদনা এক ধরনের শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি আপনি আল-কুরআন তিলাওয়াত করেন, দেখবেন গর্ভধারন এবং শিশু জন্মদান নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

পবিত্র কুরআনে সূরা লুকমান এর ১৪তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ـ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ـ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

অর্থ ঃ আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে। তাই আমি নির্দেশ দিলাম আমার ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে।

সূরা আহকাফ এর ১৫ নং আয়াতে একই নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ـ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا .

অর্থ ঃ আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে।

কষ্ট সহ্য করে তাকে দুগ্ধ দান করেছে। আল-কুরআনে গর্ভধারণ করা প্রসঙ্গ নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেনি। এই যে গর্ভধারণের বিষয়ে ইসলাম নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করল এ ধরনের অধিকার দানকে আপনি সেকেলে, নাকি আধুনিক বলবেন?

আল্লাহর দৃষ্টিতে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হলো– 'তাকওয়া' তথা আল্লাহভীতি বা 'ন্যায়নীতি'।

পবিত্র কুরআনে সূরা আল হুজুরাত এর ১৩তম আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে আহ্বান করে ঘোষণা করেছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

অর্থ ঃ ওহে মানবমণ্ডলী! আমরা তোমাদের এক জোড়া মানব-মানবী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পরিচিতির জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।

লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ এগুলো ইসলামের কোনো মাপকাঠি নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া'। কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ কি নারী এটাও কোনো মাপকাঠি নয়। পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরান এর ১৯৫ তম আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন–

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ

অর্থ ঃ আমি তোমাদের কোনো কর্মীর কাজ নষ্ট করি না, সে নারী হোক কি পুরুষ, তোমরা পরস্পরের সঙ্গী।

আল কুরআনের ৩৩ নং সূরা আল আহযাব এর ৩৫ নং আয়াতে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি গুণের কথা বলা হয়েছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ –মুসলিম নর ও মুসলিম নারীর জন্য

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ –বিশ্বাসী নর ও নারীর জন্য

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ – একনিষ্ঠ নর ও নারীর জন্য

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ – সত্যবাদী নর ও নারীর জন্য

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ –ধৈর্য ও সহনশীল নর ও নারীর জন্য

وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ – বিনয়ী নর ও নারীর জন্য

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ – সৎ নর ও সতী নারীর জন্য

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ – রোযাদার নর ও নারীর জন্য

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ – লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নর ও নারীর জন্য

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ – আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী নর ও নারীর জন্য।

আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এ আয়াতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামে আত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য নারী-পুরুষের জন্য সমান।

উভয়কে ঈমান আনতে হবে, সালাত আদায় করতে হবে, সাওম পালন ও যাকাত আদায় করতে হবে ইত্যাদি।

কিন্তু ইসলাম নারীদের জন্য বিশেষ শিথিলতা প্রদর্শন করেছে।

যদি তিনি ঋতুবতী বা গর্ভবতী হন তাহলে তাঁকে সাওম পালন করতে হবে না, তবে পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য ভালো হলে সাওম পালন করতে হবে। ঋতুকালীন ও সন্তান জন্মদানের পর তাঁকে সালাত আদায় করতে হয় না। পরবর্তীকালেও এ সালাত আদায় করতে হবে না।

অর্থনৈতিক অধিকার

পশ্চিমাদের ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নারী, তিনি বিবাহিত হন বা নাই হন, কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হতে পারেন, বিলি-বণ্টন করতে পারেন, মালিকানা আদান-প্রদান করতে পারেন। ইংল্যান্ডে ১৮৭০ সালে প্রথম বিবাহিত মহিলাকে কারো সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে সম্পদ অর্জন ও বণ্টন করার আইনগত অধিকার দান করা হয়। অথচ ইসলাম নারীদেরকে পশ্চিমাদের তুলনায় ১৪০০ বছর পূর্বে সেই অর্থনৈতিক অধিকার দান করেছে। তাহলে এ অধিকার কি সেকেলে, নাকি আধুনিক?

নারীর অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র

ইসলামে একজন নারী কাজ করতে ইচ্ছুক হলে করতে পারে। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কোনো দলিল নেই, যতক্ষণ না তা হারাম হবে। সে বাইরেও যেতে পারবে তবে তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে শরীয়াহ সমর্থিত পোশাক

পরিধান করে যেতে হবে। কিন্তু প্রকৃতি নির্ধারিত কারণে তিনি তাঁর দেহ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনীমূলক কোনো কাজে অংশ নিতে পারবেন না। যেমন মডেলিং, অশ্লীল সিনেমা এবং এ ধরনের নানাবিধ কাজে। আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ আছে যা নারীর জন্য হারাম এবং পুরুষের জন্যও হারাম। যেমন- সুরা বা মদ সরবরাহ করা। জুয়া খেলা, অন্যান্য অসৎ ব্যবসা– এ সব কাজ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই নিষিদ্ধ। আদর্শ মুসলিম সমাজ নারীদের ডাক্তারি ও শিক্ষকতা পেশা গ্রহণে উৎসাহিত করে। আমাদের মহিলা গাইনোকোলজিস্ট প্রয়োজন। আমাদের মহিলা নার্স প্রয়োজন, মহিলা শিক্ষিকা প্রয়োজন। তারা এসব সেবামূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারেন।

তবে একজন মহিলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো বাধ্য-বাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পরিবারের পুরুষের ওপর অর্পিত। অতএব জীবিকার্জনের জন্য তার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। বাস্তবতা বিবেচনায় যেখানে অর্থনৈতিক সংকট আছে, সেখানে তার কাজ করার সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। তিনি তার নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করবেন।

যে সকল পেশার কথা আমি উল্লেখ করলাম এর বাইরে তিনি ঘরে দর্জির কাজ করতে পারেন। এমব্রয়ডারী, কুমারের কাজ বা ঝুড়ি তৈরির কাজসহ তার সাধ্যানুযায়ী যে কোনো বৈধ কাজ করতে পারেন।

নারীদের জন্য গড়ে ওঠা ফ্যাক্টরি বা ছোট আকারের কারখানাতেও কাজ করতে পারেন। নারীদের জন্য পৃথক সেকশন করা আছে এমন স্থানে কাজ করতে পারেন। কেননা ইসলামে নারী-পুরুষে মেলামেশার বিধি-নিষেধ রয়েছে। তিনি ব্যবসা করতে পারেন। যেখানে লেনদেনের প্রশ্ন আসে, বিশেষ করে বিদেশী কোনো পুরুষ বা গায়রে মাহরামের সাথে লেনদেনের প্রশ্ন আসে সেখানে তিনি পিতা, ভাই, স্বামী অথবা পুত্রের মাধ্যমে এগুলো করতে পারেন।

আমি আপনাদের সর্বোত্তম উদাহরণ দিতে পারি। আমার উদাহরণের সেই নারী ব্যক্তিটি হলেন– বিবি খাদীজা (রা) যিনি আমাদের নবী করীম (স)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে সফল মহিলা ব্যবসায়ী এবং তিনি তাঁর স্বামী নবী মুহাম্মদ (স) -এর মাধ্যমে লেন-দেন করতেন।

অধিকার আছে কিন্তু দায় নেই

একজন নারী পুরুষের তুলনায় অধিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে। তবে সবসময় মনে রাখতে হবে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নারীর ওপর অর্পিত নয়।

এটা পরিবারের পুরুষের ওপর ন্যস্ত। এটা বিয়ের পূর্বে পিতা বা ভ্রাতার ওপর এবং বিয়ের পর স্বামী অথবা সন্তানের ওপর ন্যস্ত। বিয়ের পর তার থাকা, খাওয়া, পোশাক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব তার স্বামীর ওপর বর্তায়। একজন মহিলা বিয়ের সময় একটা উপহার পাচ্ছেন, যাকে বলা হয় 'দেনমোহর'।

পবিত্র কুরআনে সূরা আন-নিসা এর ৪র্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থ ঃ নারীদের তাদের মোহরানা নিজ ইচ্ছায় দিয়ে দাও।

বিবাহকে ইসলাম পবিত্র করণার্থে দেনমোহরের বিষয়টি আবশ্যকীয় করেছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মুসলিম সমাজে কুরআনের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করে নামমাত্র দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়। যেমন- ১৫১ রুপী, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৭৮৬ রুপী; অথচ তারাই রিসিপশন, সাজানো, ফুল, দুপুরের ও রাতের খাবারের পেছনে লাখ লাখ রুপী খরচ করছে। ইসলাম দেনমোহরের ক্ষেত্রে কোনো সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। কিন্তু যখন কেউ রিসিপশনেই লাখ লাখ রুপী খরচ করে সেক্ষেত্রে দেনমোহর তুলনামূলক যথেষ্ট পরিমাণ হওয়া উচিত।

একথা সত্য যে, মুসলিম সমাজে বহু অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিশেষ করে পাক-ভারত এলাকায়। তারা সামান্য দেনমোহর দিয়ে আশা করে স্ত্রীর নিকট হতে ফ্রিজ, টিভি প্রভৃতি আসবাব। আশা করে স্ত্রী তাকে ফ্ল্যাট দেবে, গাড়ি দেবে ইত্যাদি। স্বামীর মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে দাবি করে বিরাট অংকের যৌতুক। সে যদি গ্রাজুয়েট হয় তাহলে ১ লাখ রুপী আশা করতে পারে, যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে ৩ লাখ, যদি ডাক্তার হয় তাহলে ৫ লাখ। অথচ একজন স্বামীর জন্য তাঁর স্ত্রীর নিকট সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে যৌতুক দাবি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যদি কনের পিতা-মাতা একেবারে নিজ ইচ্ছায় কোনো কিছু দেয় তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাবি করা বা জোর করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কোনো মহিলা যদি চাকরি করেন, তবে যে আয়ই তিনি করুন, তা পুরোপুরি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এক পাইও তার স্বামীর জন্য খরচ করতে তিনি বাধ্য নন। তবে যদি নিজ ইচ্ছায় করতে চান, সেটা তাঁর ব্যাপার। স্ত্রী যত সম্পদশালীই হোক না কেন, তাঁর থাকা-খাওয়া ও অভাব মেটানোর খরচ স্বামীকেই বহন করতে হবে। যদি তালাকের মতো বা স্বামী হারানোর মতো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে 'ইদ্দত' কাল পর্যন্ত খোরপোশ পাবেন। সন্তান থাকলে তাদের খরচও লাভ করবেন। ইসলাম বহু

শতাব্দী পূর্বে নারীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দান করেছে। যদি আপনি কুরআন অধ্যয়ন করেন তাহলে সূরা নিসা, সূরা বাকারা ও সূরা মায়িদার বহু আয়াতে আপনি পাবেন একজন নারী তিনি স্ত্রী, মা, বোন বা কন্যা যাই হোন না কেনো তার উত্তরাধিকার রয়েছে এবং আল-কুরআনে এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। আর আমি জানি, এরপরও কেউ কেউ অন্ধের মতো মন্তব্য করেন যে ইসলামের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু এ বিষয়টি পরিষ্কার করার সময় আমি পাব না। তবে আল্লাহ চাইলে আমি আশা করি এ বিষয়ে একটা প্রশ্ন পাব এবং তখন বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করব।

সামাজিক অধিকার

ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকারকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই অধিকারগুলো দেয়া হয়েছে কন্যাকে, স্ত্রীকে, মাকে ও বোনকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এ অধিকারগুলো স্বতন্ত্র। ইসলাম কন্যাকে যে অধিকার দিয়েছে সে দিকটায় লক্ষ্য করুন। ইসলাম নারী ও শিশু হত্যা নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সূরা তাকভীর এর ৮ম ও ৯ম আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .

অর্থ : যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?

শুধু কন্যা সন্তান হত্যাকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি? সকল প্রকার শিশু সে পুত্র বা কন্যা শিশু যাই হোক না কেন?

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সূরা আন-আম এর ১৫১তম আয়াতে বলেছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ . نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .

অর্থ : আর তোমরা খাদ্য দানের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদের ও তাদের আহার যোগাই। সূরা ইসরার ৩১তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ . إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا .

অর্থ : আর খাদ্য দানের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তাদের রিযিক দেই ও তোমাদেরও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা বড় ধরনের অপরাধ।

ইসলামপূর্ব আরবে যখনই কোনো কন্যা শিশু জন্মলাভ করতো, তাদের বেশিরভাগকেই জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। আলহামদুলিল্লাহ! ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে এ শয়তানি প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও ভারতে এ কুপ্রথা প্রচলিত। বিবিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, 'তাকে (কন্যা) মরতে দাও' নামক অনুষ্ঠানে এমিনি বেকমেন নামক একজন ব্রিটিশ নাগরিক তার রিপোর্টে বলেন, অনাগত সন্তানটি কন্যা জেনে প্রতিদিন ৩০০০-এর বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হয় (এ বৃটিশ নাগরিক ভারতে কন্যা শিশু হত্যার পরিসংখ্যান প্রণয়ন করেন।) অনুষ্ঠানটি স্টার টিভিতেও সম্প্রচার করা হয়েছে। যদি আপনি এ সংখ্যাকে ৩৬৫ দ্বারা গুণ করেন তাহলে দেখতে পাবেন ভারতে প্রতি বছর এক মিলিয়নেরও অধিক কন্যা ভ্রূণ-এর গর্ভপাত করানো হচ্ছে। আর তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাজ্যে বড় বড় পোস্টার ও প্রচারপত্র শোভা পাচ্ছে যেগুলোতে বলা হচ্ছে, '৫০০ রুপী খরচ করুন ৫ লাখ রুপী বাঁচান।' এর অর্থ কী? আল্ট্রাসনোগ্রাম বা ঐ ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষায় ৫০০ রুপী খরচ করে দেখুন, মা কোন শিশু বহন করছেন? যদি কন্যার ভ্রূণ হয় তাহলে গর্ভপাত করুন। পাঁচ লাখ রুপী বাঁচান-কীভাবে? তাকে লালন-পালন করতে কয়েক লাখ রুপী খরচ হবে, বাকিটা তার বিয়ের যৌতুক হিসেবে। তামিলনাড়ু সরকারি হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী– জন্মগ্রহণকারী প্রতি ১০টি কন্যা শিশুর মধ্যে ৪টি শিশুকে হাসপাতালে মারা যাওয়ার জন্য ফেলে রেখে যাওয়া হয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভারতে পুরুষ জনসংখ্যার চাইতে নারী জনসংখ্যা কম। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ ইন্ডিয়ায় কন্যা শিশু হত্যাযজ্ঞ চলে আসছে।

যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১০০০ পুরুষের বিপরীতে ৯৭২ জন মহিলা ছিল। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান ও আদমশুমারি অনুযায়ী ১০০০ পুরুষের বিপরীতে ৯৩৪ জন নারী। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে ১০০০ জন পুরুষের বিপরীতে ৯২৭ জন নারী। বিশ্লেষণ করলে আরও দেখতে পাবেন, নারীর অনুপাত প্রতিনিয়ত কমছেই এবং বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে এ ধরনের শয়তানি চর্চা ততোই বাড়ছে।

ইসলাম আপনাদের সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করেছে। সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন। আপনি কি এ সকল অধিকারকে সেকেলে বলবেন নাকি আধুনিক? ইসলাম নবজাতককে হত্যা করতেই কেবল নিষেধ করেনি, বরং এই হত্যাকাণ্ডের

কঠোর তিরস্কার করে এবং পুত্র সন্তান জন্মের আনন্দকেও ঘৃণা করে এবং কন্যা সন্তান হত্যা করাকেও দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল এর ৫৮ ও ৫৯তম আয়াতে বলা হচ্ছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ـ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ـ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ـ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ـ

অর্থ ঃ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রাখবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের ফয়সালা কতই না নিকৃষ্ট।

ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী, একজন কন্যাকে সঠিক পদ্ধতিতে লালন-পালন করতে হবে। রাসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে যথাযথভাবে লালন করবে, সে শেষ বিচারের দিন এরকম আমার সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন যে আমার খুবই নিকটবর্তী হবে। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ২টি কন্যাকে সঠিকভাবে লালন-পালন করবে, তাদের ভালোভাবে যত্ন করবে, তাদের স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইসলামে ছেলেমেয়ে লালন পালনের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হয়নি। রাসূল (স) -এর আরেকটি হাদীস থেকে জানা যায় তিনি বলেন, নবী করীম (স) এর উপস্থিতিতে এক লোক তার ছেলেকে চুমু দিল এবং উরুর ওপর রাখল কিন্তু মেয়ের সাথে তেমনটি করল না। রাসূল (স) তাৎক্ষণিক এ ঘটনার প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, তুমি অন্যায়কারী, তোমার উচিত তোমার মেয়েকেও চুম্বন করা এবং তাকে অন্য উরুতে বসানো। নবী করীম (স) ন্যায় বিচারের কথা শুধু মুখেই বলতেন না, বাস্তবেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন।

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার

অতীতের সকল সভ্যতাই নারীকে 'শয়তানের যন্ত্র' বিবেচনা করতো। কুরআন নারীকে 'মুহসানা' আখ্যা দিয়েছে যার অর্থ 'শয়তান থেকে সুরক্ষিত।' কেউ উত্তম চরিত্রের অধিকারী নারীকে বিয়ে করলে সে তাকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং সিরাতুল মুস্তাকীম এর ওপর টিকিয়ে রাখে।

একটি হাদীসে রাসূল (স) বলেন, 'ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই।' সহীহ আল-বুখারীর ৭ম খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ের ৪ নং হাদীসে রাসূল (স) যুব সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিয়ে করে। এটা তাদের চক্ষুকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। সাহাবী আনাস (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে নবী করীম (স) বলেন, যে বিয়ে করে সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করে।

প্রসঙ্গক্রমে একজন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে যদি কেউ দু'বার বিয়ে করে তবে কি তার দ্বীন পূর্ণ হবে বলে এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

লোকটি রাসূল (স) -এর বাণীটি ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়েছে। যখন রাসূল (স) ঘোষণা করলেন, তুমি যখন বিয়ে করলে তখন অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করলে, এর অর্থ হলো, যখন তুমি বিয়ে করলে, এটা তোমাকে অবাধ যৌনতা, ব্যভিচার, সমকাম ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, যা এ পৃথিবীর অর্ধেক পাপ।

শুধু বিয়ের মাধ্যমেই আপনি স্বামী বা স্ত্রী হতে পারেন, বিয়ের মাধ্যমেই আপনি পেতে পারেন পিতা-মাতা হওয়ার সুযোগ। ইসলামে পিতা-মাতার কর্তব্যের অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্যের খুবই গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং কেউ এক, দুই, তিন বা চার বিয়ে করলে কোনো পার্থক্য নেই, সে দ্বীনের অর্ধেকই পূর্ণ করল।

পবিত্র কুরআনে সূরা রূম এর ২১তম আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ـ

অর্থ ঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গীদের বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার, তদুপরি তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে ৪ নং সূরার ২১ নং আয়াতের বর্ণনানুসারে– বিবাহ একটি পবিত্র চুক্তি, কনট্রাক্ট। সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ـ

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য নারীদের জোর করে অধিকারভুক্ত করা যায়েজ নেই।

অর্থাৎ বিয়েতে উভয়ের অনুমতি ও সম্মতি প্রয়োজন। এটা আবশ্যক যে, নর-নারী উভয়কে বিয়েতে সম্মতি দিতে হবে অন্য কেউ এমনকি পিতাও তার কন্যার অসম্মতিতে বিয়েতে বাধ্য করতে পারবেন না।

সহীহ আল বুখারীর- ৭ম খণ্ডের ৪৩ তম অধ্যায়ের ৬৯নং- হাদীসে বলা হয়েছে– এক নারীর পিতা তার অসম্মতিতে বিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি মহানবীর নিকট গেলেন, মহানবী (স) তার বিয়ে বাতিল করে দেন।

ইবনে হাম্বল-এ ২৪৬৯ নং হাদীসে আছে – এক কন্যাকে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিয়ে দেন। মেয়েটি বিষয়টি রাসূলের নিকট পেশ করলে রাসূল (স) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে বিয়ে বহাল রাখতে পার, অথবা বিয়ে বাতিলও করতে পার। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন।

নারী গৃহবধূ নয় গৃহকর্ত্রী

ইসলাম নারীকে 'হোম মেকার' বা গৃহকর্ত্রী এর মর্যাদা দিয়েছে। সে হাউস ওয়াইফ নয় কারণ তাকে হাউস-এর সাথে বিয়ে দেয়া হয়নি। অনেকে অর্থ না জেনেই পরিভাষা ব্যবহার করে। হাউজ ওয়াইফ অর্থ, হাউজ-এর স্ত্রী বা গৃহবধূ। তাই আমার বিশ্বাস গৃহিণী না বলে এখন থেকে আমার বোনেরা তাদেরকে 'গৃহকর্ত্রী' বলা বেশি পছন্দ করবেন। কেননা তারা অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকেন। অর্থাৎ গৃহ বা সংসারের দেখ ভাল করেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে একজন নারীকে মনিবের সাথে বিয়ে দেয়া হয় না, যে তার সাথে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করবে– তাকে সমমর্যাদার একজনের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়।

ইমাম ইবনে হাম্বল-এর সংকলিত হাদীসে বলা হয়েছে, পরিপূর্ণ মুমিন তারাই, যারা চরিত্র ও আচরণের দিক দিয়ে সর্বোত্তম এবং যারা তাদের পরিবার ও স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।

ইসলাম নর-নারীকে সমঅধিকার দান করেছে, যেমন মুহতারাম বিচারপতি এম. এম. কাজী উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন বলে– নর-নারী, স্বামী-স্ত্রীর সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার শুধু পরিবারের নেতৃত্বের ক্ষেত্র ছাড়া। আল-কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .

অর্থ ঃ নারীদের পুরুষের ওপর তেমনি ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে যেমনি রয়েছে পুরুষের নারীদের ওপর, তবে তাদের ওপর পুরুষের মর্যাদা এক স্তর বেশি।

আমি সম্পূর্ণরূপে বিচারপতি এম. এম. কাজীর সঙ্গে একমত যে, বেশিরভাগ মুসলিম এ আয়াতটি ভুল বুঝেছেন। কেননা বলা হয়েছে, "পুরুষের এক স্তর বেশি"। আমি বলেছি আমাদের কুরআনকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

এটাই ৪ নং সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ .

অর্থ ঃ পুরুষেরা নারীদের রক্ষক ও ব্যবস্থাপক, কারণ আল্লাহ একজনকে অপরজন থেকে অধিক মর্যাদা দান করেছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।

লোকজন বলেন قوام অর্থ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে। কিন্তু বাস্তবে قوام শব্দটি اقامة শব্দমূল থেকে এসেছে। ইকামত অর্থ যেমন আপনি নামাযের পূর্বে ইকামত দেন, আপনি দাঁড়ান। সুতরাং ইকামত অর্থ দাঁড়ানো। অতএব কওয়াম শব্দের অর্থ দায়িত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়। আপনারা যদি ইবনে কাসীরের তাফসীর পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন– তিনি বলেন, দায়িত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়। এ দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিতে পালিত হবে। একই ধরনের প্রেক্ষাপটে সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

অর্থ ঃ তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক।

পোশাক কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়? এটা ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ত্রুটি ঢেকে রাখবেন, একে অপরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবেন, এটা হাত এবং হাতমোজার সম্পর্ক। আল-কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে পছন্দ নাও কর, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর।

সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا .

অর্থ ঃ আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে

আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। এমনকি আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে অপছন্দও করেন, আপনাকে তার সঙ্গে দয়া-মমতার আচরণ করতে হবে। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সমান। ইসলামে এ ধরনের অধিকারকে আপনি সেকেলে বলবেন নাকি আধুনিক?

মাতৃত্বের অধিকার

মায়ের সম্মানের ওপরে এক সম্মানই আছে তা হলো আল্লাহর ইবাদাত। কুরআন শরিফের ১৭ নং সূরা ইসরা-এর ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔

অর্থ ঃ আর আপনার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না, আর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে।

পিতা-মাতা যদি একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যান তখন এমন শব্দ তাদের সামনে বলবেন না যাতে তারা মনে কষ্ট পান, বরং সম্মানের সাথে কথা বলবে, তোমাদের দয়ার ডানাকে তাদের ওপরে ছড়িয়ে দেবে এবং বলবে প্রভু আমার, তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা স্নেহ দিয়ে আমাদের লালন করেছেন ছোটবেলায়।

৬নং সূরা আনআমের ১৫১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থ ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

৩১ নং সূরা লুকমানের ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۔

অর্থ ঃ আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু' বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

৪৬ নং সূরা আহকাফ-এর ১৫ নং আয়াতে একই নির্দেশ হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۔

অর্থ ঃ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করার জন্য, কষ্ট সহ্য করে তার মাতা গর্ভে ধারণ করেছেন; কষ্ট সহ্য করে তার মাতা তাকে প্রসব করেছেন।

ইবনে মাজাহ ও আহমাদে বর্ণিত একটি হাদীস–'জান্নাত মায়ের পদতলে।' এর মানে এই নয় যে, মাতা রাস্তায় হাঁটছেন আর তার পদধূলি, ময়লা ইত্যাদি জান্নাত হবে।

সহীহ বুখারীর খণ্ড ৮, অধ্যায়-২, হাদীস নং-২ এবং সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত আছে– এক লোক নবী করীম (স) -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, এ দুনিয়ায় কে আমার সদাচরণ ও সম্মান পাওয়ার বেশি দাবিদার? রাসূল (স) উত্তর দিলেন, তোমার মাতা, তারপর কে? তোমার মাতা। তারপর কে? তোমার মাতা। লোকটি চতুর্থ বার জিজ্ঞেস করল তারপর কে? নবী করীম (স) বললেন, তোমার পিতা।

আলোচ্য হাদিসটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম ৭৫% সম্মান মায়ের জন্য এবং পিতার জন্য ২৫% সম্মান।

মায়ের জন্য রয়েছে চারভাগের তিনভাগ সম্মান, মর্যাদার প্রথমাংশ এমনকি উত্তমাংশ মাতার জন্য, বাকি চার ভাগের একভাগ সম্মান এবং মর্যাদা পিতার জন্য। অল্প পরিসরে বলতে গেলে স্বর্ণের পদক মায়ের জন্য, রৌপ্যের পদক পিতার জন্য, আবার ব্রোঞ্জের পদক মাতার জন্য হলে পিতার জন্য শুধু সান্ত্বনা পুরস্কার।

আমি খুবই খুশি, আমার ভাইয়েরা এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যথায় আমি ক্ষমা চাই যদি আমার ভাইদের মনে আঘাত দিয়ে থাকি। আমি দুঃখিত ইসলাম আমাকে এরূপই বলে।

বোন হিসেবে নারীর অধিকার

৯ নং সূরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۔

অর্থ ঃ আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।

এখানে اَوْلِيَاءُ শব্দের অর্থ সহায়ক ও ব্যবস্থাপক, অর্থাৎ তারা একে অপরের সহায়ক ও ব্যাবস্থাপক। সংক্ষেপে, তারা পরস্পরের ভাই বোন সদৃশ। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, নারীরা 'সাকাত'; 'সাকাত' অর্থ বোন। এর আরেক অর্থ 'অর্ধেক'। অর্থাৎ মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত– নর ও নারী। এর অর্থ অর্ধেকও হয়, বোনও হয়।

ইসলামে নারীর অনেক সামাজিক অধিকার রয়েছে যা আলোচনা করতে কয়েক সপ্তাহ প্রয়োজন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারছি না। যেমন বহুবিবাহ, ডিভোর্স ইত্যাদি। কেননা আমাকে

অন্য বিষয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি বুঝতে পারি ইনশাআল্লাহ এ আলোচনা প্রশ্নোত্তর পর্ব কভার করবে। আমি আশা করি, এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব।

বিদ্যার্জনের অধিকার

আল-কুরআনের প্রথমে নাযিলকৃত পাঁচ আয়াত হলো সূরা আলাকের ১-৫ নং আয়াত।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

অর্থ ঃ পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একবিন্দু রক্তপিণ্ড দ্বারা।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ -'পড়, তোমার প্রভু বড়ই সম্মানিত'

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -'যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন'

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -'যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

আল-কুরআনের প্রথম নির্দেশনা যেটা মানবতার প্রতি নাযিল হয়েছিল তা নামায নয়, রোযা নয়, যাকাত দান নয়- তা ছিল পড়া। অর্থাৎ ইসলাম শিক্ষা গ্রহণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

নবী মুহাম্মদ (স) পিতা-মাতাকে সর্বাধিক তাগিদ দিয়েছেন যেন তারা কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দেয়। একজন নারীর বিয়ের পর স্বামীর দায়িত্ব হলো তাকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা। সে যদি নিজে এটা করতে সক্ষম না হয় কিন্তু স্ত্রী যদি তা চায় তাহলে স্বামী অন্য কোথাও শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্ত্রীকে যেতে দেবেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী নারীরা জ্ঞানার্জনের জন্য ছিলেন খুবই আগ্রহী। তাঁরা একদা রাসূল করীম (স)-কে বললেন, আপনি সাধারণত পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, আপনি আমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করলে আমরা আপনাকে (প্রয়োজনীয়) প্রশ্ন করতে পারতাম। রাসূল করীম (স) রাজি হলেন। তিনি নিজে তো যেতেনই অনেক সময় সাহাবীগণকেও তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করতেন।

ভেবে দেখুন, ১৪০০ বছর আগে যখন নারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হতো, তাদের শিক্ষা প্রদান তো দূরের কথা, তাদেরকে পণ্যদ্রব্যের মতো অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে

বিবেচনা করা হতো, সে মুহূর্তে নারীর শিক্ষাদানের প্রতি কতোই না তাকীদ দেয়া হয়েছে।

আমার কাছে এরূপ একাধিক বিদূষী মুসলিম নারীর উদাহরণ আছে। আমি আপনাদের যে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দিতে পারি তিনি হলেন বিবি আয়েশা (রা.) যিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর কন্যা এবং প্রিয়নবী (স.) -এর স্ত্রী। তিনি রাসূলের সাহাবাগণ এমনকি খলিফাদের পর্যন্ত দিকনির্দেশনা দিতেন। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ভাগিনা উরওয়া ইবনে জুবাইর (রাঃ)। তিনি বলেছেন, আমি কুরআনের ব্যাপারে আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি; ফরয, হালাল, হারাম এবং আরবি, ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতায় তার জ্ঞানের তুলনা নেই।

হযরত আয়েশা (রা) শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই দক্ষ ছিলেন না চিকিৎসা বিষয়েও তার ছিল অগাধ জ্ঞান। যখনই কোনো বিদেশী প্রতিনিধি রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে আসতেন এবং আলোচনা করতেন, তিনি তাদের গবেষণাধর্মী আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তা মনে রাখতেন। গণিতশাস্ত্রেও তাঁর ভালো দখল ছিল, অনেক সময় সাহাবিগণও মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার বিষয়ে তাঁর নিকট সমাধান নিতে আসতেন। মিরাস কত অংশে বিভক্ত হবে, প্রত্যেকে কত অংশ পাবে এ সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি এসব বিষয়ে এতোটাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে অনেক সময় তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কেও দিকনির্দেশনা দিতেন। নিয়মিত অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে তিনি স্বয়ং ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

উম্মে আবি মুসার মতে তিনি [আয়েশা (রা)] একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেছেন, যখনই আমাদের সাহাবীদের কোনো বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হতো আমরা তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট যেতাম এবং অবশ্যই তাঁর নিকট এ বিষয়ের জ্ঞান ছিল। তিনি ৮৮ জনের অধিক পণ্ডিতকে শিক্ষা দিয়েছেন। সংক্ষেপে বললে তিনি ছিলেন পণ্ডিতদের পণ্ডিত।

আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, এমনকি হযরত সুফিয়া (রা.) যিনি রাসূল (স.) -এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি ইসলামী ফিকহ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। ইমাম নববীর মতে, 'হযরত সুফিয়া (রা) ঐ সময়ের মহিলাদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিমতী ছিলেন।' আরেক দৃষ্টান্ত হযরত উম্মে সালামা (রা.) যিনি প্রিয়নবী (স)-এর স্ত্রী ছিলেন। ইবনে হাজারের মতে 'তিনি বিভিন্ন ধরনের ৩২ জন পণ্ডিতকে শিক্ষা দিয়েছেন।' আরো অনেক উদাহরণের মধ্যে ফাতিমা বিনতে কায়েসের কথা এসে যায়। বলা হয় যে,

তিনি একবার হযরত আয়েশা ও হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে সারাদিন ফিকহ শাস্ত্রের ওপর আলোচনা করার পরও কেউ তাঁকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। ইমাম নববী (র)-এর মতে, তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহন করেন এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

অনন্য উদাহরণ হলো– হযরত উম্মে সুলাইম, যিনি হযরত আনাস (রা) এর মাতা, তিনি দাওয়াহর ক্ষেত্রে অনেক ভালো ভূমিকা রাখেন। যেমন সাইয়্যেদা নাফিসা যিনি হাসান (রা) এর পৌত্রী ছিলেন, চার মাযহাবের এক প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর শিক্ষিকা ছিলেন। আরো উদাহরণ যেমন উম্মে দারদা (রা), যিনি আবু দারদার স্ত্রী এবং বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। উম্মে দারদা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, তিনি এ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। আপনি এমন আরো উদাহরণ দিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, সে সময়ে যখন নারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো, যখন জন্ম লাভের সাথে সাথে নারীদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো, তখন চিকিৎসা, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমান নারীরা ছিলেন দক্ষ। কারণ ইসলাম ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক নারী হবেন শিক্ষিত। তাহলে আপনি ইসলাম প্রদত্ত নারীর এ অধিকার প্রদানকে সেকেলে বলবেন নাকি আধুনিক বলবেন?

আইনানুগ অধিকার

ইসলামি আইন অনুযায়ী নর-নারী সমান। শরিআত নর-নারী উভয়ের জীবন এবং সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

হত্যার শাস্তি

যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে সে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে, আর তা হলো সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

পবিত্র কুরআনের ২নং সূরা বাকারার ১৭৮ ও ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

'তাকেও হত্যা করা হবে। যদি কোনো নারী হত্যা করে তাকেও হত্যা করা হবে।'

ইসলামের আইন অনুসারে নারী পুরুষের 'কিসাস' সমভাবে চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দেহের বদলে দেহ উভয়ে সমান শাস্তি পাবে। এমনকি যদি মৃতের অভিভাবক নারী হয় এবং বলে যে, হত্যাকারীকে মাফ করে 'দিয়াত' অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর– তার মতকেও বাতিল করা যাবে না।

তাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে। যদি নিহতের আত্মীয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়, কেউ বলে হত্যাকারীকে হত্যা করাই উচিত, কেউ বলে 'দিয়াত' গ্রহণ করে তাকে মাফ করে দেয়া উচিত, তাহলে লোকদের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া থেকে ফিরিয়ে রাখা উচিত। সমভাবে নারী-পুরুষ যেই মতামত দিক না কেনো তার গুরুত্ব একই।

চুরির শাস্তি

আলোর দিশারী আল কুরআনের ৫ নং সূরা মায়িদার ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ .

অর্থ ঃ চোর সে নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেনো, তার হাত কেটে দাও, (এটা) তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত।

অর্থাৎ নারী পুরুষ যেই চুরি করুক তার হাত কাটা হবে, উভয়ের জন্য শাস্তি একই।

ব্যভিচারের শাস্তি

সর্বশেষ ঐশী কিতাব আল কুরআনের ২৪ নং সূরা নূরের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে– اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থ ঃ কেউ যদি ব্যভিচার করে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেনো তাকে ১০০ দোররা মার।

ব্যভিচারের শাস্তি সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেনো তার শাস্তি একই অর্থাৎ ১০০ দোররা, ইসলামে নারী পুরুষের একই শাস্তি। উভয়ের অপরাধকেই এখানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করা হয়েছে। নারীর ওপর কোনোরূপ বাড়তি প্রেসার দেয়া হয়নি।

সাক্ষ্যদানের অধিকার

ইসলামে মহিলাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। ইসলাম একজন নারীকে ১৪০০ বছর পূর্বে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। অথচ আধুনিককালে ইহুদি পুরোহিতরা নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয়া হবে কিনা বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। কুরআনুল কারীমের ২৪ নং সূরা নূর এর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .

অর্থ ঃ যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট অপরাধে দুই জন সাক্ষী এবং বড় অপরাধের ক্ষেত্রে চার জন সাক্ষী প্রয়োজন হয়। যে কোনো নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইসলামে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অতএব এরূপ অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে।

আধুনিক সমাজে আপনি দেখবেন পুরুষ নারীকে অপবাদ দিচ্ছে, তাদেরকে বাজে ধরনের গালাগাল দিচ্ছে, তাদেরকে বেশ্যা আখ্যা দিচ্ছে, কিন্তু কিছুই করার নেই।

ইসলামি রাষ্ট্রে কেউ যদি জনসমক্ষে অথবা অন্য কোথাও নারীকে বেশ্যা বলে, এ জন্য সে যদি পুরুষকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, তাহলে চার জন সাক্ষী হাজির করতে হবে। সে যদি চার জন সাক্ষী আনে এবং তাদের একজনও দ্বিধান্বিত হয় তাহলে এ সাক্ষ্যদাতাদের সকলকে ৮০ দোররা মারা হবে। ভবিষ্যতে তাদের সকলের সাক্ষ্যও অগ্রহণযোগ্য। এভাবেই ইসলাম নারীদের সতীত্বের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

সচরাচর যখন কোনো মহিলার বিয়ে হয় তখন সে স্বামীর নাম গ্রহণ করে। ইসলামে সুযোগ আছে ইচ্ছে করলে স্বামীর নাম গ্রহণ করবে অথবা তার কুমারী নামই থাকবে। কুমারী নাম বলবৎ রাখার সুযোগ ইসলামে আছে এবং আমরা অনেক মুসলিম সমাজ পাই যেখানে বিয়ের পরেও তারা বিবাহপূর্ব নাম বহাল রাখে। কারণ, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। আপনি কি একে সেকেলে বলবেন নাকি আধুনিক?

রাজনৈতিক অধিকার

সামাজিক অর্থনৈতিক, আইনানুগ ইত্যাদি অধিকারের পাশাপাশি ইসলাম নারীকে দিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯ নং সূরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ـ

অর্থ ঃ আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।

ভোটাধিকার

তারা কেবল সামাজিক সহায়কই নয়, রাজনৈতিকভাবেও নারী পুরুষ পরস্পরের সহযোগী। ইসলামে নারীদের ভোট প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে।

যদি আপনি ৬০ নং সূরা মুমতাহিনা-এর ১২ নং আয়াত পড়েন, দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে– يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ

অর্থ ঃ ওহে নবী! মুমিন নারীরা যখন আপনার নিকট আনুগত্যের শপথ নিতে আসবে।

এখানে আরবি শব্দ يبايعن -এর অর্থ আধুনিক ও বর্তমান ভোটের চেয়েও অধিক ক্ষমতা, কারণ নবী মুহাম্মদ (স) শুধু আল্লাহর রাসূলই ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্র প্রধানও ছিলেন এবং নারীরা নবী করীম (স) এর নিকট আসতেন এবং তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিয়ে সম্মতি দিতেন। অতএব ইসলাম নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করেছে।

আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের অধিকারও ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে। ভোটাধিকারের পাশাপাশি নারীরা আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে। সহীহ হাদীস মতে, হযরত ওমর (রা.) সাহাবীদের সঙ্গে মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন, যাতে যুবকেরা বিয়েতে উৎসাহিত হতে পারে। পিছনের সারি থেকে একজন মহিলা প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, যখন কুরআন বলে– وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا . "তুমি মোহর হিসেবে বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিতে পার" (সূরা নিসা : ২০) তাহলে পবিত্র কুরআন যেখানে কোন সীমা নির্ধারণ করেনি, সেখানে সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওমর কে? তৎক্ষণাৎ ওমর (রা) বলে উঠলেন, ওমর ভুল করেছেন, মহিলাই সঠিক।' ভেবে দেখুন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মহিলা, যদি বিখ্যাত কোনো মহিলা হতেন তাহলে হাদীসে তাঁর নাম আসতো। যেহেতু হাদীসে তাঁর নাম আসেনি, আমরা অনুধাবন করতে পারি যে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মহিলা। অর্থাৎ একজন সাধারণ মহিলা রাষ্ট্র প্রধানের কাজে প্রতিবাদ করলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, তিনি সংবিধান-চ্যুতি বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ কুরআন মুসলিমদের সংবিধান। এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝাযায় যে, একজন মহিলা আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার

রাসূল (স) এর যুগে নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন। বুখারী শরীফে পূর্ণ একটা অধ্যায়ই রয়েছে "যুদ্ধক্ষেত্রে নারী"। নারীরা পানি সরবরাহ করেছেন, সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। এখানে নাসিবা নামের একজন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি ওহুদ যুদ্ধে প্রিয় নবী (স)-কে প্রতিরক্ষায় অংশ

গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। কুরআন যেহেতু বলে, পুরুষ নারীদের সংরক্ষক, এ কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া উচিত নয়। এটা নিশ্চিত করা পুরুষের দায়িত্ব। শুধু প্রয়োজনেই নারীদের অনুমতি প্রদান করা যাবে; অর্থাৎ তাঁরা কেবল প্রয়োজনেই যুদ্ধে যাবেন, অন্যথায় নয়।

অধিকারে পরিসীমা ও বাস্তবতা

আধুনিক যুগে নারীর অধিকারের ব্যাপারে আমরা সোচ্চার হলেও বাস্তব চিত্র খুব একটা সুখকর নয়। অধিকারের পরিসীমা ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে নারী-পুরুষ এবং একে অপরে প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে তাদের অবস্থা আজ ভোগ্যপণ্যের মতো। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের উপমা দেয়া যেতে পারে। তাদের নারীরা ১৯০১ সাল থেকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি লাভ করে কেবল নার্সের কাজ নিয়ে। পরবর্তীতে নারী অধিকার আন্দোলন যা ১৯৭৩ সালে শুরু হয়। তারা দাবি করল, কেনো নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না? অতঃপর ১৯৭৬ সালের পর আমেরিকার সরকার নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে।

১৯৯৩ সালের ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের এক রিপোর্ট অনুসারে তাদের একটি কনভেনশনে ৯০ জন সৈন্য যৌন নিপীড়নের শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে ৮৩ জন নারী। এছাড়া ১১৭ জন অফিসারকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়। ভেবে দেখুন মাত্র একটা কনভেনশনে ৮৩ জন নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হন। ঐ ১১৭ জন কর্মকর্তার অপরাধ কী ছিল? তারা নারীদের দৌড়াতে বাধ্য করেছিল, তাদের পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারা তাদের যৌন অঙ্গগুলো অনাবৃত করে উলঙ্গ অবস্থায় প্যারেড করতে বাধ্য করেছিল।

জনসাধারণের সামনে যৌন ক্রিয়া করেছিল। আপনি কি এটাকে নারী অধিকার বলবেন? যদি আপনি একে নারী অধিকার বলতে চান তাহলে আপনি এ অধিকার আপনার পকেটে রাখতে পারেন। আমরা আমাদের বোন, আমাদের কন্যা, আমাদের মায়েদের যৌন নিপীড়নের শিকার হতে দিতে চাই না। পার্লামেন্টে হৈ চৈ পড়ে গেল, প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি জনসাধরনের সামনে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' আপনারা অবগত আছেন রাজনীতিবিদরা যখন বলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে, তখন কী হয়?

অতএব ইসলাম নারীদের শুধু জরুরি অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। তবে তাদের ইসলামী হিযাব, ইসলামী নিয়ম এবং সতীত্ব বজায় রাখতে হবে।

ইসলাম সমতায় বিশ্বাসী

শুরুতে আমি বলেছি ইসলাম নারী-পুরুষের সমনাধিকারে বিশ্বাস করে, সমঅধিকার বলতে সমরূপ বোঝায় না। ধরুন, একটি শ্রেণিতে ২ জন ছাত্র A এবং B কোনো এক পরীক্ষায় যৌথভাবে প্রথম হয়েছে। তারা প্রত্যেকে ৮০% নম্বর পেয়েছে। A ও B দুজনই ১০০জনের মধ্যে প্রথম হয়েছে। যখন আপনি প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলেন এবং দেখলেন, ১০টি প্রশ্ন প্রতিটিতে পূর্ণ নম্বর ১০ করে। প্রথম প্রশ্নে A ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে B পেয়েছে ৭, প্রথম প্রশ্নে A ছাত্রটি B এর চেয়ে বেশী। দুই নম্বর প্রশ্নে A পেয়েছে ১০-এর মধ্যে ৭ এবং B পেয়েছে ৯। দ্বিতীয় প্রশ্নে B ছাত্রটি A এর চেয়ে ভাল। ৩নং প্রশ্নে উভয়ে সমান। যোগ করে A ও B সমান নম্বর ১০০-র মধ্যে ৮০। সংক্ষেপে A ও B ছাত্রদ্বয় সমান যদিও কোনো প্রশ্নে A ভালো আবার কোনোটিতে B ভালো। একই রূপে দৃষ্টান্তটি ধরে আল্লাহ পুরুষকে বেশি দিয়েছেন। মনে করুন, ঘরে একজন চোর ঢুকেছে, তখন আপনি কি বলবেন আমি নারী অধিকারে বিশ্বাসী, আপনি কি আপনার মাতাকে, বোনকে অথবা কন্যাকে বলবেন যাও এবং চোরের সাথে যুদ্ধ কর। না, বরং স্বাভাবিকভাবে আপনি নিজেই যুদ্ধ করবেন, যদি প্রয়োজন হয় তারা হয়তো আপনাকে সাহায্য করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহ যেহেতু আপনাকে শারীরিকভাবে অধিক শক্তি দিয়েছেন, আপনাকেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং চোরকে ঠেকাতে হবে। সুতরাং শারীরিক শক্তিতে পুরুষ নারীর চেয়ে এক ডিগ্রী ওপরে। আরেকটি উদাহরণ যেখানে পিতা-মাতাকে সম্মান দেওয়ার প্রশ্ন, যেখানে সন্তানদের মাতাকে পিতার ৩ গুণ সম্মান দিতে হবে। এখানে নারীদের পুরুষের চেয়ে ওপরে রাখা হয়েছে। অতএব গড়ে সমান। সুতরাং ইসলাম সমতায় বিশ্বাস করে, সমরূপতায় নয়। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে গড়ে নর-নারী সমান। উভয়েই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

মুসলিম সমাজ যা করছে তা ভিন্ন। অনেক মুসলিম সমাজ নারীদের তাদের অধিকার দিচ্ছে না এবং তারা কুরআন সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেছে। পশ্চিমা সমাজ বহুলাংশে এ জন্য দায়ী। পশ্চিমা সমাজগুলোর কারণেই অনেক মুসলিম সমাজ রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে। তাদের সাবধানী ভূমিকা এবং একপেশে নীতির কারণে অনেক নারীই কুরআন সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেছে। আবার কিছু মুসলিম সমাজ নিজেদের পশ্চিমা সংস্কৃতির আলোকে উন্নত করতে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির অনুকরণ করছে। তাই মুসলিম সমাজের বর্তমান চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে

ইসলামে নারীর অধিকার বিচার সমীচিন নয়। শেষে আমি পশ্চিমা সমাজকে বলতে চাই, যদি আপনারা ইসলামে নারীর অধিকারকে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এটা আধুনিক, মোটেও সেকেলে নয়।

নারী অধিকারের ভুল ধারণা ও উত্তরণের পথ

নারীর অধিকার নিয়ে নানান ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ইসলাম নারীর অধিকার মূল্যায়ন করে মর্যাদার আলোকে। কারণ মর্যাদার মাঝেই রয়েছে অধিকার, যার অংশীদার পুরুষও।

'নারী অধিকার' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা এর ২২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط

অর্থ : তাদের মতো নারীদেরও একই ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তবে পুরুষের মর্যাদা এক স্তর ওপরে।

আয়াতের এ অংশ কুরআনের অন্য কোনো অংশের দ্বারা ব্যাখ্যায়িত হয়নি। আয়াতের পরের অংশে বলা হয়েছে– 'পুরুষের মর্যাদা নারীর এক স্তর ওপরে।' তাই এ অংশের প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ এখানে এসেই অধিকাংশ লোক থমকে দাঁড়ায়; এমনকি কিছু বিশ্লেষকও ভুল অর্থ অনুধাবনের প্রয়াস পান।

প্রথমে স্মরণ রাখতে হবে যে, এর পরবর্তী অংশে অধিকার সংক্রান্ত কিছুই আলোচিত হয়নি। অধিকারগুলো সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে যেখানে বলা হয়েছে, 'নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমঅধিকার রয়েছে।'

'পুরুষের নারীদের ওপর এক স্তর বেশি সুবিধা রয়েছে' এ আয়াত পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে আমরা সূরা নিসার আরেকটি আয়াতের দিকে তাকাই–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

অর্থ : পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। – (নিসা:৩৪)

প্রথমত, এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুরুষেরা নারীদের সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক।'

আরো বলা হয়েছে– 'আল্লাহ একজনকে অপরের অধিক দান করেছেন।'

অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, নারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী এবং পৃথক প্রকৃতির অধিকারী যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সত্য। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রকৃতিই তাকে (পুরুষকে) এ সুবিধা প্রদান করেছে, এজন্য এ বিষয়ে পুরুষের যেমন কোনো কৃতিত্ব নেই তেমনি নারীর কোনো অসম্মানও নেই। এসব সুবিধা পুরুষকে এজন্য দেয়া হয়েছে যে, প্রাকৃতিকভাবে সে এ কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম। অর্থাৎ নারীকে যে সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার সাথে অধিকারের কোনো সম্পর্ক নেই। পুরুষদের এ সুবিধা প্রদান নারীর গুরুত্ব ও অধিকার কোনটিই কমায় না।

এখন যে প্রশ্নটা উঠে আসে তা হলো আজকের সামাজিক কাঠামো। এটা স্বীকার করতে হবে যে, পুরুষের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক দায়িত্ব হলো নারীদের রক্ষা করা। এটা খুবই গভীর অনুভূতি যা অনুধাবন করা দরকার। একজনের জীবন রক্ষার অনুভূতি অবশ্যই কোনো সামগ্রিক ও সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় নয়। প্রশ্ন হলো– পুরুষেরা তাদের কর্ম সম্পাদন করছে কি না? আপনি যদি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে, যে সকল পুরুষ তাদের গুরুদায়িত্ব ত্যাগ করেছে তা হলো নারীদের নিরাপত্তা। অতএব তারা তাদের আসল কর্তব্যেই অবহেলা করেছে।

তবে এ প্রশ্ন থাকছেই– কে এই দুঃখজনক অবস্থার জন্য দায়ী? হতে পারে নারীরা। হতে পারে এ অবস্থার জন্য তারাও দায়ী। বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা না করার ফলে নারীর ওপর এক ধরনের অপরাধ এবং জুলুম চেপে বসেছে।

বিখ্যাত দার্শনিক এবং মহাকবি ড. ইকবাল 'নারীর সংরক্ষণ' নামক কবিতায় নারী-পুরুষের এ চূড়ান্ত নাজুক সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলেছেন। আল্লামা ইকবাল এর ভাষায়– ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور

আমার মনের মাঝে আছে এক জীবন্ত সত্য লুকায়িত।

کیا سمجیگاوہ جسکے راگوں سے ہے لحو سرد

কী, করে বুঝবে সে যার শিরায় শীতল রুধির প্রবাহিত।

نہ پردہ نہ تعلیم نیبی ہو کی پرانی

পর্দাও নেই শিক্ষাও নেই নতুন কিংবা পুরাতন

نسوانیت ای جنکا نگاہ بان ہے فقط مرد

নারীর মর্যাদা রাখতে পারে কেবল পুরুষজন।

جس قوم نے یہ زندہ حقیقت کونہ پایا۔

যে জাতি বুঝতে না পারে এ বাস্তব সত্য

اس قوم کا خورشید بہت جلد ہواجرد۔

তার সৌভাগ্যের সূর্য হবে অবশ্যই অস্তমিত।

তাহলে এক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা হলো কুরআনের মূল বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা। অতএব, আসল সমাধান হলো জনগণকে শিক্ষিত ও আলোকিত করে তোলা।

প্রসঙ্গত, থমাস জেফারসনের বিখ্যাত উক্তিটি মনে করিয়ে দিতে চাই। তার মতে, 'একটা জাতি যখন আশা করে– আশা করে অজ্ঞ থাকতে কিন্তু স্বাধীন হতে, সে এমন আশা করে যা কোনোদিন ছিল না আর কোনোদিন হবেও না'। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

وہ معجزتھے زمانے میں مسلمان ہوکر

اور تم خوار ہوئے تارک قراں ہوکر

'তাঁরা মুসলমান হয়েই যুগের সম্মানিত ছিলেন, আর তোমরা কুরআন ছেড়ে দিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছো।

[নারী অধিকারের ভুল ধারণা ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক শেষোক্ত অনুচ্ছেদটি সরাসরি ডা. জাকির নায়েকের নয়। তার আলোচনার বিষয় হিসেবে অনুচ্ছেদটি প্রাসঙ্গিক বিধায় এখনে সংযোজন করা হলো। –সম্পাদক]